# অনন্য দেশবন্ধু

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা

আমরা যদি দেশনেতারূপে দেশবন্ধুর মতো এক অসামান্য পুরুষকে পেয়ে থাকি তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর ঠিক আগের সময়কে ব্যাপ্ত করে যাঁরা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্যই তিনজন—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ। এছাড়াও, এই বিপ্লববাদ ও নেতৃত্বদানের অন্তরালে আর একজন হিতৈষী ছিলেন, তিনি ভগিনী নিবেদিতা। এই চারের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ যোগজীবনে পাড়ি দিলেন; ভারতকন্যা নিবেদিতা তাঁর পাশ্চাত্যের জীবনকে দূরে ঠেলে দিয়ে এদেশে বহু ভাবী মহীরুহের বীজ বপন করলেন। এদেশের মাটিকে আপন করে নিবেদিতা দেখালেন ত্যাগ, তিতিক্ষা, দেশপ্রেম ও অপরিমেয় আদর্শনিষ্ঠা। এমনই জ্যোতিষ্ক-খচিত আকাশ যখন ভারতকে ব্যাপ্ত করেছে, তেমনই এক শুভলগ্নে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদয় হয়েছিল, হয়তো বা এক বিরাট যুগপরিবর্তন-ধারায় এক বিশেষ ক্ষণ তৈরি হয়েছিল, যে-ক্ষণে তিনি মাত্র ছয়বছরের রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াইকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (৫ নভেম্বর ১৮৭০—১৬ জুন ১৯২৫) অধিকার করেছিলেন এক আদর্শময় মহৎ জীবন। অল্প পরিসরে তাঁর সেই জীবনকে তুলে ধরা, বলা ভাল, এককথায় অসম্ভব। তাই ব্যারিস্টার (বার. অ্যাট. ল.) চিত্তরঞ্জন থেকে দেশবন্ধু (Friend of all) হওয়ার যে পথে তিনি চলেছিলেন—সেই পথটুকু স্মরণে রাখার চেষ্টায় এই প্রবন্ধের অবতারণা। রাজা থেকে ফকির হওয়ার নানা কাহিনি আমরা শুনেছি। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের রাজা থেকে ফকির হওয়াকে কোন সাধারণ মানুষের দৃষ্টান্তে ফেলা উচিত নয়। চিত্তরঞ্জন আগাগোড়া ছিলেন রাজকীয়, একই সঙ্গে সর্বত্যাগে সন্ন্যাসিতুল্য। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি কেন 'দেশবন্ধু' নাম পেলেন, সেকথা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যদি একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। দেশবন্ধুর জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তবুও এই ঘটনাটির উল্লেখ করার কারণ হলো, এতে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, সহনশীলতা, রসিকতা, নির্লিপ্ততা, শব্দবাণে প্রতিপক্ষকে বেঁধার ক্ষমতা ইত্যাদি দুর্লভ গুণ খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনাটি এইরকম—চিত্তরঞ্জন দাশ তখন প্রতিযশা ব্যারিস্টার। বেলুড়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিথিপূজায় গিয়েছেন আমন্ত্রিত অতিথিরূপে। এই খবরটি প্রচারিত হয়ে যায় এবং 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কানে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, আর্থিক অনটনে যখন ঐ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল তখন চিত্তরঞ্জনই অর্থদান করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লেখেন: "বেলুড়ে যেন এইরূপ স্বর্ণগর্দভ গিয়া স্থানটি অপবিত্র না করে।"[১] দেশবন্ধু এই খবরটি পড়লেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় নির্বিকারচিত্তে একটু হেসে বললেন: "সুরেশ ভুল করেছে।... স্বর্ণগর্দভ তাকেই বলে যে শুধু টাকার বোঝাই বয়। আমি তো তা নই। আমি দুহাতে টাকা রোজগার করি, খরচ করি দশ-হাতে।"[২] এইরকমই ছিলেন 'ব্যারিস্টার-কুল-চূড়ামণি'[৩] মিঃ সি. আর. দাশ।

সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে যেমন পূর্ব এবং উত্তর জীবন খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, দেশবন্ধুর ক্ষেত্রেও পূর্ব এবং উত্তর জীবন—এই দুইয়েরই মাহাত্ম্য চোখে পড়ে। এই দুটি জীবনকে মেলালে তবেই তিনি পূর্ণাঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হন। আর, খণ্ডিত দৃষ্টিতে তিনি কেমন? পুরানো

চিত্তরঞ্জন—নব কলেবরে চিত্তরঞ্জন। রাজা—ফকির। অমিত বিত্তশালী—ত্যাগের রাজা। ভোগবিলাসী—ভোগহীন। যার বিত্ত অপরিমিত তার সর্বস্বত্যাগ আর যার বিত্ত পরিমিত তার সর্বস্বত্যাগ এই দুইয়ের পার্থক্য আকাশপাতাল। জীবনের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো খোলসকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে নবজন্মের উষার আলোয় তিনি উদ্ভাসিত হয়েছিলেন—'...যে-মূর্তির সামনে স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নত করে থাকেন।'* সেকালে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন ছিলেন কলকাতার অন্যতম ধনী। পেশায় তিনি প্রখর বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। এক এক দিনে তাঁর রোজগার হাজার হাজার টাকা। কখনো লক্ষ টাকাও রোজগার করেছেন দিনে। যা রোজগার করতেন তা কয়েক ঘন্টায় খরচও করে ফেলতেন—শুধু নিজের এবং নিজ পরিবারের বিলাসবহুলতায় নয়—খরচ করে ফেলতেন অপরিমিত দানে। তিনি মনে করতেন, তাঁর রোজগারে সকলের অধিকার আছে। সাধারণের অধিকার সম্পর্কে এমন সচেতনতা সেযুগে অন্য কোন অভিজাত ব্যক্তি এবং কংগ্রেসের অন্য সদস্যদের মধ্যে দেখা যায়নি। সেদিক থেকে চিত্তরঞ্জন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের মানুষ। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় (১৪৮ নং রসা রোড) তিনি থাকতেন, কিন্তু তাঁর অনাসক্ত জীবন চলত নিত্যনতুন ছন্দে। পরবর্তিকালে যখন তাঁর 'দেশবন্ধু' নামে আত্মপ্রকাশ ঘটল, তখন সেকালের ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তেজনাময় ইতিহাসে গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর ঐক্য ও সঙ্ঘাত ইতিহাসের পটপরিবর্তনে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। স্বায়ত্তশাসন নয়, আমাদের চাই পূর্ণ স্বরাজ—চরমপন্থা অবলম্বন করে একটি ভিন্ন মতাদর্শের পথ তৈরি করে দেশের মানুষকে তাদের নিজ স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সফল হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ছয়বছর রাজনীতিতে কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং মাত্র পঞ্চান্ন বছরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দেশবন্ধুর এই অকালপ্রয়াণে দেশে তৈরি হয়েছিল নেতৃত্বের এক সুগভীর শূন্যতা। তার মূল কারণ হলো, সেকালে দেশবন্ধুর সমকক্ষ ত্যাগী নেতা সমগ্র দেশে এবং কংগ্রেসেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। একথা ধ্রুব সত্য। অন্য ধনী নেতাদের ত্যাগে ছিল নির্দিষ্ট গণ্ডি, কিন্তু দেশবন্ধু তাঁর ত্যাগে ছিলেন বেহিসাবি, দিলখোলা। সাধারণের ন্যায্য অধিকার দিতে সদা তৎপর।

চিত্তরঞ্জনের বংশগৌরব ছিল। ঢাকা বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে এক বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। ঢাকা বিক্রমপুর স্বনামধন্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানেই ছিল রাজা বল্লালসেনের রাজধানী। বিক্রমপুরের পশ্চিমে পদ্মা আর পুবে মেঘনা। এহেন নদীমাতৃক দেশ কারমাইকেল সাহেবকে তাঁর দেশ স্কটল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৫-তে তিনি লিখেছেন: "Vikrampur seems to resemble in some ways my native land of Scotland...."* চিত্তরঞ্জনের পিতামহ বরিশালে সরকারি আইনজীবী ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। এঁদের পত্নীরাও ছিলেন তুলনাহীনা। ভুবনমোহনের স্ত্রী নিস্তারিণীদেবী আটটি সন্তানের জননী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। ভুবনমোহন ধনাঢ্য মানুষ হলেও ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে—যেমন দাতা তেমনি সহৃদয় ও সংস্কৃতিমনস্ক। কাব্যচর্চা, কবিতা রচনা ও সঙ্গীতপ্রেমে ঋদ্ধ তিনি। নিজেই স্তোত্র-গান রচনা করে সকালবেলায় গাইতেন প্রতিদিন।* সেই গান শুনে ঘুম ভাঙত নাতি-নাতনিদের। সাহানাদেবীর (ইনি আজীবন সুরসাধিকা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা) স্মৃতিচারণে—"দাদুর গানেই বেশির ভাগ দিন আমাদের ঘুম ভাঙত...।"* ভুবনমোহনের প্রথম সন্তান তরলাদেবীর মেয়ে সাহানাদেবী (ও তাঁর বোন) পিতৃবিয়োগের (পিতা ডাঃ প্যারীমোহন গুপ্ত) পর থেকে মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাই মামাবাবু চিত্তরঞ্জন এবং মামিমা বাসন্তীদেবীকে খুব কাছ থেকে তিনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মামার বাড়ির অশেষ স্নেহ পেয়েছেন। নিস্তারিণীদেবীর ছিল সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, অতিথি-বাৎসল্য আর বিরাট মন।* বীজের মধ্যে যেমন ভাবী বৃক্ষের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি বালক চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও তেমনই এক ছায়াশীতল বনস্পতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক গুণাবলিই অনেকাংশে তাঁকে চিত্তরঞ্জন থেকে দেশবন্ধুতে রূপান্তরিত করেছিল—একথা না মেনে উপায় নেই।

ছেলেবেলায় চিত্তরঞ্জন দেখেছেন তাঁর বাবার আইনি পসার এবং তাঁর অফুরন্ত দান। তিনি ধার করে দান করতেন। বাবা ভুবনমোহন অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতেন। উপার্জনকে ছাপিয়ে তাঁর দান তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তাঁর সহৃদয়তার এই সুযোগ নিয়ে বহু মানুষ তাঁকে ঠকিয়েছে এবং উপকৃত হওয়ার পরে সেই উপকার ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গ পর্যন্ত ত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি। তাঁর বেশ কিছু বন্ধুর অনুরোধে তাদের জামিনদার হতে হতে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। আর, যাদের জন্য তিনি দেউলিয়া হলেন তারা আর ভুলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। এমত অবস্থাতেও মা নিস্তারিণীদেবী সংসারের অনটনকে সামলেছেন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে, উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে, দায়িত্বপালনের ইচ্ছায় এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধের অস্ত্রে। কোনদিন কোন অভাববোধ মায়ের চেহারায় ছাপ ফেলতে পারেনি। মায়ের এই অপূর্ব চরিত্রখানি এবং পিতার সদাশয়তার সম্মিলনে তৈরি হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেমিক হৃদয়, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম আইনি দৃষ্টি—বিশেষত অপরাধ আইনে বিশেষ পটুতা। বিলেতে তিনি গিয়েছিলেন আই.সি.এস. হতে, কিন্তু ঘটনাচক্রে হলেন ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরে পিতার ঋণ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। প্রথম দিকে তাঁর তেমন পসার হয়নি। যৎসামান্য পারিশ্রমিকে মামলা লড়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, কয়েক বছরের মধ্যেই হাইকোর্টে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং অফুরন্ত অর্থ তিনি উপার্জন করতে লাগলেন। এরপর পিতার ঋণ শোধ করে 'দেউলিয়া' নাম ঘোচালেন। চিত্তরঞ্জনের পসার বাড়তে লাগল। তাঁকে একদিকে মা লক্ষ্মী যেন ঢেলে দিয়েছেন, অন্যদিকে মা সরস্বতীও আসন পেতেছেন। এই দুই কৃপা যদি অফুরন্ত হয়, তাহলে জীবন কেমন হয়? চিত্তরঞ্জনেরও ঠিক তেমনটাই হয়েছিল।

আগে আসি মা সরস্বতীর বরপুত্র চিত্তরঞ্জনের কথায়। চিত্তরঞ্জন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে এবং তিনি প্রতি মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাম দিয়েছিলেন 'নারায়ণ'। এটি ছিল সেকালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। আইনজ্ঞ হিসাবে চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি যত বেড়েছে, সাহিত্যচর্চাও তত

দুটো ওপরে সোজা টান করে তুলে ধরে বলতেন: "নে পকেটে যা আছে।" পকেট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার পর মামাবাবু একবারও চেয়ে দেখতেন না—কত নিল।[১০] চিত্তরঞ্জনের প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা কতটা ছিল তা একটু জানা দরকার, নইলে তাঁর দানের হিসাব পাওয়া যাবে না। প্রচুর রোজগারের অর্থে তিনি রসা রোডের সেই বিশাল বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তখন লোকের মুখে মুখে ছড়াত। বাড়িতে তাঁর ভোগবিলাসের নানা উপাদান। টেবিলে দেশি-বিদেশি নানা খাবার। সবচেয়ে ভাল দামি পোশাক। দামি তামাক, দামি চুরুট। জনশ্রুতি, তাঁর পরিবারের জামাকাপড় নাকি কেচে আসত সারা পৃথিবীর বিলাসের আস্তানা ফ্রান্স থেকে, প্রতি সপ্তাহে নাকি তাঁর বাড়িতে একটি পার্সেল আসত সেখান থেকে। তিনি দাড়ি কামিয়ে নাপিতকে দিতেন দশ টাকা, কুলিকে দু-আনার জায়গায় দু-টাকা। দান করতেন, যেন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন—জাতপাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আর্তত্রাণে, জনহিতকর কাজে, কংগ্রেস ফান্ডে। হতদরিদ্র ছাত্র, নিঃস্ব ভিখারি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা, ঋণভারে জর্জরিত শিক্ষক, চিকিৎসার ব্যয়বহনে অক্ষম রোগী, আর্ত মানুষ, আত্মীয়, বন্ধু, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, পত্রিকার সম্পাদক—সকলের জন্য দাতা চিত্তরঞ্জনের দুয়ার খোলা। এদের মধ্যে বেশির ভাগই উপকার পেয়ে নিন্দায় প্রত্যুত্তর দিত, কিন্তু চিত্তরঞ্জন কখনো এদের নিরাশ করেননি, কখনো দানে বিমুখ হননি।

এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বেশ কয়েকবার এসে চিত্তরঞ্জনের দেখা না পেয়ে ফিরে যান। একদিন মনে অনেক দ্বিধা নিয়ে এসে দেখা পেয়েছেন তাঁর। চিত্তরঞ্জন কুণ্ঠিত—যেন অপরাধ করে ফেলেছেন—ব্রাহ্মণ ফিরে গিয়েছেন তাঁকে না পেয়ে কয়েকবার। সেদিন তিনি মামলা করে আয় করেছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। পুরো রোজগারটাই তুলে দিলেন সেই ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ ছলছল চোখে হতবাক। আর-একবার চিত্তরঞ্জন মামলা জিতে পেলেন এক লক্ষ টাকা ফি (fee)। সব টাকা তোড়ায় বাঁধা—দু-তিনজন লোক গুনছে। তিনি ওদের বললেন যার মুঠিতে যত টাকা ওঠে তুলে নিতে। সবাই নিল, কিন্তু একজন লোক কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিত্তরঞ্জন এক আঁজলা টাকা তুলে নিলেন এবং সেই লোকটির অঞ্জলি ভরে দিলেন। ভাগনি সাহানাদেবীর কথায়—"ভোগী হলেও ভোগ জিনিসটা তাঁর অন্তরের গভীর স্তরের বস্তু ছিল না। মানুষটি ছিলেন নির্লিপ্ত।... সিল্কের গেঞ্জি চাকর সামনে তুলে ধরলে যেমন দুহাতে তুলে গায়ে দিতেন, আবার শতছিদ্র গেঞ্জি ধরলেও একইভাবে দুহাত তুলে তাই পরতেন—এ আমরা বহুবার দেখেছি।"[১১] চিত্তরঞ্জন অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন বিপ্লবীদের। ১৯১৯-এ মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশের পর বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ মহাত্মা গান্ধীকে জানিয়ে তিনি কংগ্রেস ফান্ডে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকার প্রসারে, পুরুলিয়ার অনাথ আশ্রমে, নদিয়ার নিত্যানন্দ আশ্রমে, বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পে তিনি বহু টাকা দান করেছেন। চিত্তরঞ্জনের রাজকীয় দান ছিল সকলের জন্য—তিনি দানে একটি তৃপ্তি পেতেন। সারাদিন ধরে তিনি যে কত চেক কাটতেন তার সীমা-পরিসীমা নেই। সেই চেক দেশের সর্বত্র যেত। তাঁর অর্জিত অর্থে যে সকলের অধিকার!

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজ তখন খুব সমাদৃত। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে ব্রহ্মবান্ধব তখন তীব্র আক্রমণ করছেন। ফলে তাঁকে রাজদ্রোহী ঘোষণা করা হলো। চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের অকালমৃত্যুতে সে-মামলা আর চলল না। এদিকে ১৯০৮-এ আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা উঠল এবং হাত ঘুরে চিত্তরঞ্জনের কাছে এল। এই মামলা যদিও তিনি ফি নিয়ে লড়েছিলেন, তবুও আয় ছাপিয়ে ব্যয় হওয়ায় তাঁর ঘোড়া এবং গাড়ি বেচে দিতে হলো, বাজারে দেনা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা। দশ মাস ধরে দিনে-রাতে ভয়ানক পরিশ্রম করতে লাগলেন। তারপর অসামান্য কৃতিত্বে, অতি অদ্ভুত দক্ষতায়, অসামান্য বিচক্ষণতায় তিনি আইনের কূট-জটিল তর্কজাল একে একে খণ্ডন করতে লাগলেন। এহেন আইনজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁর সম্পর্কে কোন এক সাহেব বিচারপতি বলেছিলেন—'Maker of Criminal Law' (অপরাধ আইনের স্রষ্টা)। শেষদিনের শুনানিতে যেন দেবাদিষ্ট হয়ে তিনি এমন সওয়াল করেছিলেন যে, অরবিন্দ ঘোষকে বিনা শর্তে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হলো। সাহানাদেবী বলেছেন: "...কলকাতার বাড়িতেও মামাবাবু মামিমা ওঁরা

প্রায়ই [ম্যানচেটে] বসতেন। সেই সময়ই একদিন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'স্পিরিট' এসে মামাবাবুকে শ্রীঅরবিন্দের মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে বলেন। তখন আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয়েছে।"[১১] এই মামলায় জেতার পর ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরেও তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মামলা লড়ে জিতেছিলেন। কিন্তু সময় এগিয়ে এল। ১৯২০-এর নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে তাঁর জীবনের গতিধারা সুখ-ঐশ্বর্যের পথ ছেড়ে ত্যাগের পথ ধরল। কংগ্রেস আদালত বর্জনের ডাক দিয়েছিল। তিনি সে-নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। প্রস্তুতিপর্বে ত্যাগ করলেন বাবুয়ানি ও বাবুর্চি। এরপর ছাড়লেন নেশার জিনিস। তামাক ছাড়তে একটু কষ্ট হয়েছিল, তাই যে-লোকটি তামাক সাজত তাকে টাকাপয়সা দিয়ে প্রথমেই বিদায় জানালেন। আইন পুস্তকের লাইব্রেরিটিকে পাঠিয়ে দিলেন জামাইয়ের বাড়িতে। এবার পোশাক বদলের পালা—তিনি নিজে পরলেন খদ্দরের মোটা খাটো ধুতি, বাসন্তীদেবীও মিহি জমির শাড়ি ছেড়ে পরলেন খদ্দর। ১৪৮ নং রসা রোডের প্রাসাদটিকে উৎসর্গ করলেন দেশের নামে। ছেড়ে দিলেন আইনব্যবসা—উপার্জনের পথ বন্ধ হলো। বহু অর্থ দিতে চাইলেও তিনি আর ওপথে হাঁটেননি। আর কখনো কোনো আইনি পরামর্শও তিনি দেননি। যেসময় তিনি তাঁর রোজগারের পথ বন্ধ করে দিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর রোজগার ছিল প্রতি মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। আর, বারো লক্ষ টাকার ব্রিফ আগামী একবছরের জন্য তৈরি হয়েই ছিল। দেশবন্ধু দেশবাসীর জন্য নিঃশেষে দান করেছিলেন—নিজের জন্য বা তাঁর পরিবারের জন্য রাখেননি কিছুই। স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্যা দেবী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর জাতীয়তাবাদের প্রভাব তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে এড়িয়ে চলা সেকালের কোন শিক্ষিত, রাজনীতি-সচেতন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আমরা দেখতে পাই, চিত্তরঞ্জনেরও জীবনদেবতা ছিল তাঁর দেশ। ময়মনসিংহ-বক্তৃতায় তিনি বললেন: "দেশই আমার ধর্ম, আমার চির জীবনের আদর্শ ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমি আমার ভগবানকে দেখিতে পাই।"[১২] তাই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের 'দেশবন্ধু' হওয়ার মূল প্রেরণা ছিল এই সুগভীর দেশপ্রেম। জন্মভূমির সেবায় তিনি সর্বস্বত্যাগী হয়েছিলেন। এই রাজ-ফকিরকেই দেখেছিলেন যুবক সুভাষচন্দ্র আই.সি.এস. ত্যাগ করে দেশে ফিরে—এক বিশালকায়, তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি দীর্ঘ পদক্ষেপে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর বীরত্বের মহিমা, মুখে সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ। সুভাষচন্দ্রের মনের পাতায় দাগ কেটে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রকে দেখেও মুগ্ধ হয়ে গেলেন দেশবন্ধু। রাজনীতির অঙ্গনে গুরু-শিষ্য বাঁধা পড়লেন সেদিন।[১৩] দেশবন্ধু অনন্য। কাজী নজরুলের ভাষায়—"দেখিয়াছি মোরা 'রাজা-সন্ন্যাসী' প্রেমের জগৎ-শেঠ।"[১৪] 'চিত্তরঞ্জন' কুঁড়ি থেকেই 'দেশবন্ধু' ফুল ফুটেছিল। তাঁর সাগরসঙ্গীত কাব্যের ভাষায় সেই ফুটে ওঠা এইরকম—"আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!/ আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!/ আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,/ তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!"[১৫] সত্যিকারের দেশনেতাদের এই দুর্ভিক্ষের দিনে আবির্ভাবের সার্ধশততম বর্ষে দেশবন্ধুর ত্যাগদীপ্ত জীবন আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক। ■

## তথ্যসূত্র


১ নন্দী, হীরেন্দ্রনাথ, নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব, ২য় খণ্ড, বন্ধু নন্দী (প্রকাশিকা), আগরতলা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৫

২ ঐ

৩ ঐ, পৃঃ ৫

৪ ঐ, পৃঃ ৯

৫ Dasgupta, Hemendranath, *Deshbandhu Chittaranjan Das*, Publication Division, Ministry of Information And Broadcasting, Government of India, New Delhi, 1969, p. 1

৬ দ্রঃ ibid, p. 3

৭ সাহানা দেবী, স্মৃতির খেয়া, প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ৭

৮ দ্রঃ *Deshbandhu*, p. 3

৯ স্মৃতির খেয়া, পৃঃ ৬৫

১০ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৪

১১ ঐ, পৃঃ ১২-১৩

১২ ঐ, পৃঃ ২২

১৩ নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২

১৪ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩-৪

১৫ ইন্দ্রপতন (কবিতা)

১৬ দ্রঃ স্মৃতির খেয়া, পৃঃ ৬৮


---

এই নিবন্ধটি 'হেমচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা'রূপে প্রকাশিত হলো।